উপাসী

আবদুর রউফ চৌধুরী

হুরুত্তা[১] একদিন'র উপাসী ।

শাখা-বরাক[২] নদীর জলে স্নান সমাপন করে, বাড়িতে না-ফিরে, শার্ট-লুঙ্গি পরে সরকার বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় তরমুজ; পেটের ধান্দায় । চুলগুলো কালো দেখাচ্ছে, মুখ তার এমনিতেই কালো– লম্বাটে, নাক একটু চাপা, চওড়া কপাল, চঞ্চল চোখ-দুটো ছোট । শাখা-বরাকের পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল সে, হুরুত্তা একদিন'র উপাসী । অপরাধীর মত থামা থামা গলায় বলল, 'দুর হালা আর ভালা লাগে না । ইলাখান[৩] আর কতটা জীবন কাটাইমু ।' কোনওরকম ব্যবস্থা করতে না-পারলে তার আর রক্ষা নেই । গত সন্ধ্যায় উত্তরবাড়ির কর্তীর কাছে গিয়েছিল এক সের চাউল ধার চাইবে বলে । কর্জ দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, 'সকাল সকাল চাউল ফেরৎ দেওন লাগব, নাইলে আমরা উপাসে মরমু ।' তরমুজ বলেছিল, 'বাদলির দিন । কেউর ঘরতঐ ত চাউল নাই । তোমারে চাউল দিমু কোয়াই[৪] তাকি গো চাচিজি ।' চাচীজি বলেছিলেন, 'আমি ইতা[৫] কুনতা[৬] বুজি না । আমার চাউল লাগব । চাউল চাই ।' তরমুজ চোখে আন্ধকার দেখে, সে নিজের স্বার্থ ছাড়া এ-জগতে আর কিছুই বুঝে না । সে দুটো পয়সার জন্য কী না করতে পারে! অলস-অকর্মণ্য জীবনযাপন করে বলে হয়ত সে নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করে । নিজের পন্থায় উপার্জিত অর্থ নিঃশেষ না-হওয়া পর্যন্ত সে নিজেকে নতুন কাজে সম্পৃক্ত করতে রাজি নয়; যদিও কিছুদিন পরের জমিতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছিল, তবুও না, তবে সে জেনেছে দশ-টাকার কাজ না-করলে পাঁচ-টাকার মজুরি পাওয়া যায় না, ক্রমে তাই সে হাড়ভাঙা শ্রমকাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেতে । কিছুদিন দালালিও করেছে বটে, হোক না সে গরুর দালালি বা জমির দালালি বা মাটির দালালি; কিন্তু এসব কাজে সে নিজের মনে শান্তি পায়নি, বরং তার সামনে মানুষের নিষ্ঠুর চেহারাই নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে;

---

[১] সন্তান ।

[২] টীকা: বরাক নদী মণিপুরের উত্তরে, আঙ্গামী নাগাপাহাড় থেকে উৎপন্ন । দক্ষিণাভিমুখে মণিপুর দিয়ে প্রায় ১৮০ মাইল প্রবাহিত হয়ে কাছাড়ে প্রবেশ করেছে । তারপর কাছাড়কে ভেদ করে, বদরপুরের কাছে এসে সিলেটে প্রবেশ করেছে । হরুটিকরের কাছে এসে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়ে উত্তর-শাখাটি সুরমা এবং দক্ষিণ-শাখাটি কুশিয়ারা নাম ধারণ করেছে । কুশিয়ারার একটি শাখা বিবিয়ানা নাম ধারণ করে কালনীর সঙ্গে মিশে ধলেশ্বরী নদীতে পড়েছে, আর আরেকটি শাখা-বরাক নাম ধারণ করে সরকার-বাজারের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ।

[৩] এরকম ।

[৪] কোথা ।

[৫] এরকম ।

[৬] কিছু ।

তারপর বৈধ উপায়ে টাকা উপার্জনের ধান্দা ছেড়ে দিয়ে গোপন ও অপ্রকাশ্য যতপ্রকার নীতিবিগর্হিত পন্থা তার জানা আছে সেসব পথেই অগ্রসর হয়েছে।

একটু আগেও একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন অবশ্য মেঘের আস্তর সরিয়ে একটু আলো সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঝিঙে-ফুল ভিজে ঢলঢল, গোটা গ্রামটিই যেন আলো হয়ে আছে ঝিঙে-ফুলে, ঝিঙের মাচায় ঘিরে থাকা গ্রামটি ঝিঙে-ফুলের হলুদে এক অদ্ভুত আলোর বান ডাকছে, এ-আলো গায়ে লাগলে মনে হয় কালো চামড়ার রঙও বদলে যাবে। বিঙে-ফুলের মাচার নীচ দিয়ে বয়ে চলা আশ্বিনের শাখা-বরাক নদীটি অর্ধপূর্ণতা নিয়ে অর্ধসীমানা পর্যন্ত ভরে উঠেছে, সে যেন এখন কবিতার লাইন– আপন গতিতে আত্মহারা, উদ্দাম, চঞ্চল। মাচা বেয়ে গাছগুলো যেমনি, তেমনি নদীর পাড়ের ঘাসগুলোও সপসপ করছে; ঘনসবুজ কুমড়োজালি যেন, তবে মাঝেমধ্যে হলুদ রঙের নকশি আঁকা। এসবেরই ফাঁকফোঁকরে স্বর্ণলতার মত গলে পড়ছে সূর্যের ম্লানরশ্মিটি মাঠিতে, জলেতে। বৃষ্টির আঘাত নিজের শরীরে সহ্য করে এখন সূর্যের ম্লানরশ্মিতে ঝিঙেগুলো দুলছে আপন মনে। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ঘরে আবদ্ধ থাকা গরুগুলোও ছাড়া পেয়ে বাড়ির পাশের জমিনে কাদা-মাটি শুঁকতে শুঁকতে সরল মেঠোগন্ধ ভরা কচিঘাসের সন্ধান করছে। ঘাসগুলো সূর্যের আলোর ম্লানস্পর্শে সদ্যজাগ্রত হয়ে উঠেছে যেন। এদের সঙ্গে নবীনতার প্রাচুর্যে ভরপুর সুচিকণ গ্রামটিও– কলাগাছ, বাঁশপাতা সবই সজীব, সবই স্পন্দিত; গ্রাম্যপ্রকৃতিও, যেন ক্লান্তি মুছে ফেলে নতুন যৌবনের আহ্বানে উদ্ভাসিত।

ঢাকা-সিলেটের রাস্তা ধরে সূর্যের ম্লানরশ্মি ঝরে পড়ছে, তবে শাখা-বরাকের জলের উপর শুধু কয়েকটি খণ্ডবিখণ্ড শাদা মেঘমালা উড়ে বেড়াচ্ছে। কখন যে আবার কৃষ্ণকালো মেঘের বৃষ্টিধারা ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র, কে জানে! সমানভাবে ঝরবে জলে ও ডাঙায়, ঘাটে ও মাঠে, জালে ও জেলেনৌকায়, মানুষের মাথায় ও কুকুরের গায়ে, শাখা-বরাকের পুলে ও বটতলায়, সরকার বাজার অঞ্চলের সমস্ত প্রাণীতে ও বস্তুতে, মুকিমপুর-শ্রীকৃষ্ণপুর-আইনপুর-বাঘারাই গ্রামগুলোর শ্বাসে ও নিশ্বাসে। বৃষ্টির ধারা যেন কিছু সময়ের জন্য দমবন্ধ করেছে চৌধুরী-বাড়ির বড় দামান্দ[৭], বড় মেয়ে ও তাদের সন্তানের আগমণের জন্য; একসময় অবশ্য তারা ঢাকার বাস থেকে নেমে আসে একটি ট্রাঙ্ক, কয়েকটি ছোটবড় বাকস ও একটি ব্রিফকেস সঙ্গে নিয়ে। বটতলায় দাঁড়িয়ে থাকা তরমুজ এসব লক্ষ্য করে। চৌধুরী-বাড়ির প্রতিবেশী সে; তাদেরই কৃপাপ্রার্থী সে। তরমুজের আচরণের সঙ্গে এদের অমিল থাকলেও সে এগিয়ে আসে। তাদের জিনিশপত্র নৌকায় তুলে দিতে গিয়ে তরমুজের শিরদাঁড়ায় ব্যথা ধরে। সে পঞ্চাশ টাকা নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল, 'জামাইবাবু বাকসটাইন[৮] বহুত ভার[৯]। ইতারমাঝে[১০] কড়িয়া কিতা আনচইন[১১]।' জামাইবাবু উত্তর দিলেন, 'শ্বশুর মহাশয়ের ফার্মেসীর জন্য ওষুধপত্র।' তরমুজ একথা বিশ্বাস করে না, বরং ভাঙা কণ্ঠস্বরে বলল, 'কয়দিন থাকবাইন[১২] জামাইবাবু?' জামাইবাবু উত্তর দিলেন, 'কাল সকালেই চলে যাব।' ট্রাঙ্কটি নৌকার গলুইতে রাখতে রাখতে তরমুজ আড়চোখে আরেকবার দেখে নেয় ব্রিফকেসটি। প্রথম ছেলে নিয়ে মেয়ে এসেছে বাপের বাড়িতে– নাই বললেও হয়ত এতে অনেক টাকা আছে। চৌধুরীরা করুক-বা-না-করুক, তরমুজ পরজন্মে বিশ্বাস করে না, তাই হয়ত তার পাপপুণ্যবোধটি তাদের মত নয়। বৈধভাবে অর্থ উপার্জন না-করার বৃত্তিতেই তার জীবিকা নির্বাহ, সংসার প্রতিপালন। তরমুজের মন কেমন যেন করে ওঠে। এই দেহ, এই মন বৈধভাবে অর্থ উপার্জন না-করার কামনা করে। এছাড়াই-বা তার উপায় কী! টাকার অভাবে তার হুরতারা কষ্ট পাচ্ছে, তাই এমন সুবর্ণসুযোগ সহজে হাতছাড়া করা উচিত কী! নৌকা ছেড়ে দিলেও তরমুজ বড়গাছের নীচে, শাখা-বরাকের তীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, কিছুদিন আগে আমি চৌদরি-বাড়ির পছম'র[১৩] দেওয়াল পারঅইয়া[১৪]

[৭] মেয়ের স্বামী।
[৮] বাকসগুলো।
[৯] ভারী।
[১০] এরমধ্যে।
[১১] এনেছেন।
[১২] থাকবেন।
[১৩] পশ্চিমের।
[১৪] পেরিয়ে।

আমগাছ'র ডাল বাইয়া বাড়ির প্রত্যেক ইট'র খবর লাইয়া আইছি। পাকরঘর[১৫] বাদ হকলতাঐ ইট'র বানাইল। এসব ভাবতে ভাবতে তরমুজ প্রচুর আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি করে। এ-কাজটি সমাপন করতে পারলে সে তার হরুত্তার মুখে অনেকদিন পর হাসি ফুটোতে সক্ষম হবে। দুশ্চিন্তার মধ্যেও তরমুজের বেঁচেবর্তে থাকার ছন্দে যতি পড়ে না, বরং তার ঠোঁট ভেঙে হাসির বাণ শুরু হয়। তরমুজের মধ্যে পরিশ্রম না-করে টাকা উপার্জন করার যা যা বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সবই যেন বেঁচে আছে। মনে মনে একটি কথা ভেবে সে খুব আনন্দ পেল, অবৈধভাবে টাকা উপার্জন ত নয়, ঝমঝম বৃষ্টির রাত; খরায় চৌচির হয়ে যাওয়া মৃতপ্রায় ফসলক্ষেতে অনর্গল বৃষ্টিধারায় যদি প্রাণ ফিরে আসে তাহলে চাষীর মনে যেরকম আনন্দধারার সৃষ্টি হয় সেরকম অবস্থা তরমুজেরও।

পড়ন্ত সূর্যের ম্লানরশ্মিতেও ঝকঝক করছে বৃষ্টিভেজা ঝিঙের পাতাগুলো, তবে বেশীক্ষণ এরকম থাকবে না, পূর্বদিক থেকে একটি কৃষ্ণমেঘচ্ছায়া আস্তেধীরে পশ্চিমে বিস্তৃত হচ্ছে। একটি চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তরমুজ একবার দেখে নেয় আকাশটি। আকাশ, তার কাছে মনে হচ্ছে, মেঘমালার গুণ্ঠনে আরও অবনমিত, আর মেঘের বুকে যেন সিন্ধুর বিন্দুদল জমে উঠেছে; এসব যেন তার মনে এক মোহময় আবেশ রচনা করে চলেছে। পশ্চিমের লালরঙ আকাশের গায়ে মিলে যেতে-না-যেতেই বিরাট এক কৃষ্ণমেঘমালা সরকার বাজারকে অচৈতন্যে ঢেকে নেয়; শুরু হয় গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। তালগাছটি একা, নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে থাকে; গ্রামে যাওয়ার চিকণ পথটিও; তবে বেলতলায়, আমতলায় আশ্রয় খুঁজছে মশা ও মাছি। মুকিমপুর-শ্রীকৃষ্ণপুর-আইনপুর-বাঘারাই গ্রামগুলোর দরজায় খিল তুলে ফাঁপা-শূন্য পেট নিয়ে ক্লান্তি ও ক্ষোভের ভরে ছেলেমেয়ে নিয়ে চাষীবউ ভিজে মাটির গন্ধ শুঁকে ছেঁড়া মাদুলে শরীর পাততে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তরমুজ চায়ের দোকানে বসে চা পান করছে, বাকীর খাতায় নাম লিখিয়ে; তখনও কনকনে বাতাস থামেনি। এই দোকানেও জ্বলে উঠেছে, গ্রামগঞ্জের মানুষ যেখানেই থাকে সেখানে সন্ধ্যা হতে-না-হতেই লণ্ঠনের আলো জ্বলে ওঠে। চা শেষ করে দোকানের লণ্ঠনের উন্মুক্ত অগ্নিশিখায় তরমুজ একটি সিগারেট ধরিয়ে নেয়। চৌধুরী-বাড়ির মোহ ছাড়তে পারছে না সে। চাপা একটি দীর্ঘশ্বাস ওঠে আসে তার অন্তর থেকে, একইসঙ্গে দোকানের শণের বেড়ার ফাঁকে একটি বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া ঝাপটা মেরে চলে যায় তার গালের উপর দিয়ে। তরমুজ কিছুক্ষণের জন্য নিজের মধ্যে ডুবে থাকে। দোকানের বারান্দায় ঝোলানো প্রদীপটিকে দেখে নেয় ভাঙা দাওয়ায় আশ্রয় নেওয়া কুকুরটির ঝাপসা ঝাপসা অন্ধকার খুবই পছন্দের, এই আলো-অন্ধকারে সে লেজ গুটিয়ে সামনে ছড়ানো পা-দুটোর ওপর তার মুখটি পেতে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছে। কিন্তু তরমুজের চোখে তা ধরা পড়ে না, তার চোখ আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ানো মেঘের ভেলায় আবদ্ধ। তরমুজের কাশির শব্দে কুকুরটি তার মুখ একটু তুলে কান-দুটো খাড়া করে। তার শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি প্রবল, তবে দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট, তাই শব্দটির সন্ধান করতে সে হাই তুলে উঠে দাঁড়ায়। ঘাড় ফিরে তরমুজের দিকে তাকাতে সে ওকে চেনার জন্য চেষ্টা করে, চিনতে তার ভুল হয় না। সে তরমুজের দিক থেকে মুখটি ফিরিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জিভ দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তরমুজ এই বাজারের কুকুরগুলোকে সহ্য করতে পারে না, গ্রামের গুলো ত একেবারেই না। দিনদুপুরে তাদের সামন দিয়ে হাতি গেলেও ঢের পায় না, কিন্তু রাতেই যত সমস্যা– মশা দেখলেই ঘেউঘেউ করে ওঠে; তবে বর্ষার রাতে গ্রামের কুকুরগুলো গৃহস্থের ঘরে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়ে মাথা গুঁজে ঝিমোতে থাকে, তার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে মৃদুমন্থর গতিতে চলা পায়ের শব্দে ঘেউঘেউ করে ওঠে না। ধূমপান শেষ করে তরমুজ ধীরেআস্তে যাত্রা শুরু করে বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাইরে এসে সে বুঝতে পারে, বৃষ্টিটা সত্যি ভালোভাবে পড়ছে; তবুও সে তার শার্টের দুটো বোতাম বন্ধ করে রাস্তা ভাঙতে শুরু করে। আশ্বিনের সন্ধ্যারাতের বাতাস বয়ে আসে তার মুখোমুখি; তারপর বিস্তৃত হয়ে পড়ে বটবৃক্ষের পাতায়, শাখা-বরাকের জলে, পথের ঘাসে। পথে তেমন লোকজন নেই। তরমুজের শরীরে শাখা-বরাকের আশ্বিনের জলের গন্ধ, তবুও তার ক্লান্তি নেই, সে হেঁটে চলেছে। তার হেঁটে-যাওয়া পথের পাশে, ডুবে-যাওয়া খালের কাদার ভেতর থেকে ভেসে ওঠে কই-মাগুর, আকাশের ডাক শোনার লোভে উজাই উঠেছে যেন। ভেসে

[১৫] রান্নাঘর।

ওঠা মাছগুলোর পাশ দিয়ে কয়েকজন কোঁচড়হীন পথিকের মন্থরগতিতে চলে-যাওয়া পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। অন্ধকারের মধ্যেও তরমুজ বিস্মিত চোখে দেখতে পায় পথিকের চোখগুলো কই-মাগুর ধরার লোভে বড় বড় হয়ে উঠেছে, তাদের পুতলির মধ্যে যেন শয়তানের আস্তানা। 'কাঁচা লঙ্কার চড়চড়া রানলে[১৬] বড্ড মজা[১৭] লাগত'– এ-ধরণের কথা নিরীহকণ্ঠে প্রকাশ করতে করতে পথিকদল গ্রামের আঁকাবাঁকা পথে বৃষ্টিভেজা বাঁশপাতা মাড়িয়ে ভিজেভেজা শব্দে উধাও হতে থাকে। তরমুজও বৃষ্টিভেজা পাতা-ঘাস-মাটি মাড়িয়ে শাখা-বরাকের পাড় ঘেঁষে ঝাপসা আঁধারে ঘেরা মুকিমপুরের বটতলায় এসে থমকে দাঁড়ায় তরমুজ। এরই পাশে মাদ্রাসার পাঁচিলের ইটগুলো পেতনীর দাঁতের মত যেন খিঁচিয়ে আছে। সাড়ে তিন হাতের দেওয়াল খাড়া করতে বছরের পর বছর লেগে যাচ্ছে, কিন্তু মাদ্রাসা-কমিটির কোনও খবর নেই, ইটের ফাঁকে শ্যাওলা ধরলেও সিমেন্টের টাকাগুলো ঠিকই সভাপতির পকেটে ঢেউ কাটছে। অন্যদিকে টাকার অভাবে পাঠশালার পুরনো টিনের ফুটো দিয়ে জল পড়ছে, তাই হয়ত ছাত্ররা বৃষ্টির দিনে স্কুলে আসে না। বৃষ্টির সময় পাঠশালায় পড়ার ঢেউ না-উঠলেও নদীতে ওঠে। বটতলায় দাঁড়িয়ে থাকা তরমুজ এই রাতের অন্ধকারে ঠিকই বুঝতে পারে শাখা-বরাকের জলে তরঙ্গ উঠেছে। এই অপ্রশস্ত নদীর জলে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চায় তরমুজ, ভেসে চলে যেতে চায় উজানে, ত্রিবেণী নদীর মোহনায়, সেখানে সহজেই সে খুঁজে পাবে তার শান্তির ঠিকানা, অভাবহীন জীবনের পরম সমাপ্তির সন্ধান, কিন্তু সে শান্তি কী তার কাছে শাখা-বরাক নদীর প্রশান্তি হবে; এসব ভাবতে ভাবতে তরমুজ বাস্তবে ফিরে আসে। সে মনে মনে বলে, খালি হাতে বাড়ি ফিরলে চলবে না– হুরুত্তা একদিন'র উপাসী। তার ইচ্ছে ছিল বাজার থেকে একটি ইলিশ কিনে আনার, কিন্তু হাতে নগদ পঞ্চাশ টাকা থাকা সত্ত্বেও সে আনেনি, টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে; সে জানে দুদিনের ক্ষুধায় কেউ মরে না, মারা যেতে পারে না। মৃত্যু এত সহজে আসে না। সে ত গভীর রহস্যময়ী! যখন আসে তখন সে তার কালো রূপের চিহ্নটি হঠাৎই মানুষের বাড়িতে এঁকে দেয়। পৃথিবীর সকল জীবই ত মরণশীল, তাই একে নিয়ে এত ভাবার প্রয়োজন কী! তার মাথার ভেতরটি দপদপ করছে, সে শুধু ধসে যাওয়া ইকরের বেড়া ধরে কোনওপ্রকার বেঁচে থাকতে চায়। দিশেহারা তরমুজ একসময় পাঠশালার পাশের একটি মুদির দোকানের সামনে এসে হাজির হয়। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে গিয়ে দোকানি মুখ বাড়িয়ে বলল, 'কিতা চাও তরমুজ?' রাস্তায় নীরবতার ঢল। নদীর ঘন জলতরঙ্গের উপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বটবৃক্ষটি, দম নিচ্ছে ক্লান্ত দোকানের ঝাঁপটিও। সব শেষ হয়ে যাওয়ার সময় শব্দও ফুরিয়ে আসে, তাই হয়ত তরমুজ বলল, 'গরিবর আর কিতা চাইবার আছে।' বাবরুখানের মনে সন্দেহ জেগে ওঠে, তাই তার পাঁজরের আর বুকের পাথর-কঠিন হাড়গুলো শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কাঁপতে থাকে; পাশে রাখা লণ্ঠনের আলোতে তার চোখের কালো পুতলিগুলোও অদ্ভুত দেখায়, সে বলল, 'ধার-টার চাউ না কিতা?' ম্লান হাসে তরমুজ; সে জানে, মানুষের মনে অনেক লুকানো জায়গা থাকে, সেসব কথা অন্তর খুলে সকলকে বলা বা তাদের সামনে হৃদয়ের সব পাপড়িগুলো মেলে ধরা যায় না। বাবরুখানের কাছে জীবনের তাবৎ সমস্যার সমাধান পাওয়া যাক-বা-না-যাক তবুও পারা যাবে না, যদিও তার সঙ্গে অনেকগুলো বছর পাশাপাশি থেকে কাটিয়ে আসছে। সে বুঝতে পারে, বাবরুখানের অজান্তেই তার অন্তরে অবিশ্বাসের জল ক্রমশ সৃষ্টি হচ্ছে। কথাটি মনে হতেই তরমুজের অন্তর কেঁপে ওঠে, তাই বলল, 'ধার কেটাই-বা দিব। আর চাইতাচেই-বা[১৮] কেটা! জরুরি মাত[১৯] আছে। একটি পাতার বিড়ি দেউ।'

'অখন আলাপ-টালাপ করতাম পাড়মু না। তাড়াতাড়ি বাড়িত যান লাগব।'

'তাড়াতাড়ি কিতার[২০] লাগি[২১]? ভাবীর শরীর-গতর ভালা ত?'

---

[১৬] রাঁধলে।
[১৭] সুস্বাদু।
[১৮] চাচ্ছেই-বা।
[১৯] আলাপ।
[২০] কীসের।
[২১] জন্য।

'তাইনর[২২] তবিয়ৎ ভালাই আছে। বাড়িত কাম[২৩] আছে, তাড়াতাড়ি যাওন লাগব।' তারপর একটু থেমে বলল, 'তোর স্ত্রীর তবিয়ৎ ভালা আছে ত?'

তরমুজ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বাবরুখানের দিকে। বাবরুখানের মুখে একটি গোপন আনন্দ ফুটে উঠেছে, তার শারীরিক ক্লান্তিকে সরিয়ে দিয়ে। এই আনন্দটি যেন তার মুখ থেকে ধীরেআস্তে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে অন্তরে, আর সেখানেই স্থান করে নিয়েছে তরমুজ যাকে সারাজীবন ভালোবেসে চলেছে তার ছবিটি– টানাটানা চোখ, ঢেউ তোলা বুক আর পিঠভর্তি কৃষ্ণকালো চুল। পরকীয়া প্রেমের ছাঁচটি যেন। আকাশের ঈশান কোণে জমে থাকা মেঘের আঁধারেও যেন বাবরুখানের মনের কথাটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তরমুজের চোখে ভেসে ওঠে তার স্ত্রীর ক্লান্তিভরা মুখটিও– বয়সের দীর্ঘতায় কিঞ্চিৎ জীর্ণ, মধ্য-বয়সেই যৌবন অন্তর্হিত প্রায়; যেন বাঁশের খাঁচায় আটকে আছে অনেকদিন ধরে। এই মুখটির দিকে বাবরুখান সময় পেলেই তাকিয়ে থাকে; সেই দৃষ্টি বড় দীন, বড় কাতর, বড় রাক্ষুসী। তার স্ত্রীর রূপ ও গুণের তুলনায় বাবরুখান কিছুই নয়, তবুও ত মেয়েরা ওরকম লোকই খুঁজে। মেয়েরা কী আর ফুটো চালের লোকদের সঙ্গে ঘর করতে চায়! যেখানে পয়সা নেই, নিরাপদ আশ্রয় নেই সেখানে মৌমাচিরা কেন ভিড় করবে? তাই ত দশ বছর আগে বাবরুখানের চোখ ফাঁকি দিয়ে তরমুজ তার স্ত্রীকে ঘরে তুলে এনেছিল। বাবরুখানের প্রশ্নটি এসব কথা মনে করিয়ে দিতেই তরমুজের দেহে ভীষণ রাগ ধরে যায়, তাই বলল, 'চুতমারাউনির আবার শরীর ভালা!'

'তোর বউ ত ভালামতই অতটা বছর কাটাইয়া দিল।'

'আর কিতা-বা উপায় আছে। যৌবন হেষ[২৪] অইলেও আমার কান্দাতঐ[২৫] পইড়া থাকা ছাড়া তাইর[২৬] উপায় কিতা।' আচ্ছন্ন গলায় বাবরুখান বলল, 'তোর স্ত্রী অখনও যৌবন ধইরা রাকছে[২৭], কিন্তু তোর ভাবী তাও পারিল না।'

দোকানের পাশে রাতের অন্ধকারের দিকে, ঠিক অন্ধকার নয়, একটি হালকা কৃষ্ণাভা যেন। সেদিকে তাকিয়ে তরমুজ ভাবতে থাকে, এরকম কথায় চুপ করে থাকাই ভাল। নারীসংক্রান্ত মানুষের দুঃখকে ভাগ করা যায় না। তাছাড়া নারীর ব্যাপারে মিথ্যা কথাও বলা যায় না। তাই সে বাবরুখানের কথাটি ঘুরিয়ে বলল, 'বিড়ি দেউ। নাসিরউদ্দীন বিড়ি। দুই মিনিট'র বেশ নিরাম[২৮] না।' অনিচ্ছে সত্ত্বেও একটি বিড়ি এগিয়ে দেয় বাবরুখান; সঙ্গে সঙ্গে তরমুজ বলল, 'বিড়ির দামটা লেইক্কা[২৯] রাখছত?'

'না। একটা বিড়ির আবার দাম!'

'এক সের চাউল আর এক গণ্ডা এ্যণ্ডা[৩০] দেউ?'

চমকে ওঠে বাবরুখান, 'অ্যাঁ। তাজযুব করতাচ না-কিতা।'

'কেনে? কয়টেকা বাকি আছে তোমার?'

'তার হিসাব কিতাব আছে না কিতা।'

'হিসাব করঅ। হকলতা হিসাব কইরা নেউগি।'

---

[২২] তাঁর।
[২৩] কাজ।
[২৪] শেষ।
[২৫] পাশে।
[২৬] তার।
[২৭] রাখছে।
[২৮] নিচ্ছি।
[২৯] লিখে।
[৩০] ডিম।

'অত টেকা কুনখান[৩১] তাকি পাইচ ।'

'হিতা হুনইয়া[৩২] লাভ কিতা । তোমার ঋণ'র টেকা সুদ-আসলে ফিরাইয়া দিতাম চাই ।'

'তোর আপনজন যে আমার কাছ বন্দক আছে হিতার হিসাবও করমুনি!' একটি চাপা রসিকতার আভাস বাবরুখানের কথায় ভেসে আসতেই তরমুজের অন্তর অসহ্য ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে । বুকটি কেমন যেন মোচড়ে খাঁ-খাঁ করে ওঠে । একটি ছোট্ট দৃশ্য বারবার তার মনের পটে ভেসে বেড়ায়, সেদিন ঝিঙে-ফুল তুলতে গিয়েছিল তার স্ত্রী, তাকে দেখে দোকান থেকে ছুটে এসেছিল বাবরুখান, তারপর তারা হাসল, কথা বলল, যেন অন্তরঙ্গ কৌতুকে । তরমুজ মনে মনে ভাবে, বাবরুখানের সঙ্গে কী প্রেমপ্রীতির সম্পর্ক চলছে না কী তার স্ত্রীর! হয়ত তা-ই । সুশ্রী বা সুন্দরী নারীর ইচ্ছে থাকলেও সে কী পারে নিজেকে একজন ব্যাপারীর কামলুব্ধ হাত থেকে রক্ষা করতে? হয়ত পারে না । তার স্ত্রী সত্যি সুন্দরী, হাসলে ওকে আরও সুন্দর দেখায়, দাঁতগুলো সুন্দর, চুলগুলো কৃষ্ণকালো– পিঠ জোড়া তার ঢল । হয়ত অভাবের কারণে একটু ম্লান হয়েছে তার মুখের আমেজ, এছাড়া অন্য কিছুই নয়; হয়ত আরও দশজন নারীর মতই সে । কোন নারী না চায় সংসার ও সুখ! টাকাওয়ালা পুরুষ! হয়ত সবই মিথ্যা । তার মনের ভেতরে গ্লানি জমতে শুরু করে । তরমুজের সবকিছুই ত একমাত্র তার স্ত্রী বুঝতে পারে, দশ বছর ধরে তার সঙ্গে লেগে আছে কী না! অকারণে নিজের স্ত্রীর সম্পর্কে নিজ মনে দুর্নাম রটাচ্ছে । গাঁজার মত নাসিরউদ্দীন বিড়িতে টান দিয়ে বলল, 'কিতা কইলা!'

'চল্লিশ টেকা ।'

চল্লিশ টাকার কথা শুনে তরমুজের বুকের ভেতরটি কনকনিয়ে ওঠে, তবুও সে জানে বাড়িতে তার স্ত্রী আছে, শান্তি আছে, নিরাপত্তা আছে । বাবরুখানের দৃষ্টি থেকে কামসিক্ত ঘ্রাণ তখনও সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়নি । বৃষ্টিভেজা আকাশে, মেদুর অন্ধকার থেকে একটি লণ্ঠনের হালকা হলুদ আলো যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে । সেই আলোতেই হতাশা আর বিরক্তি যেন জড়াজড়ি করে বেরিয়ে আসছে তরমুজের চলার ভঙ্গিতে । দশ টাকা হাতে নিয়ে দোকান থেকে সে দূরে সরতে থাকে ।

বাজারের টুংকাটি হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে তরমুজ । তার স্ত্রী দরজার ফাঁকে, দাওয়ায় রাখা প্রদীপের আলোতে দেখে নেয় তার স্বামীর মুখটি । বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় কিছুই খেতে দিতে পারেনি সে । তার মুখটি শুকনো দেখাচ্ছে । শরীরও তার তেমন ভালো যাচ্ছে না । সারা জীবন লড়াই করতে করতে দেহ আর কত সইতে পারে । নানা দুশ্চিন্তায় তার মন সবসময় চঞ্চল থাকে । যতদিন এই পৃথিবী থাকবে অভাবের এই সাংঘাতিক গতানুগতিকতার হাত থেকে বাঁচার চাবি কী শুধুই পুরুষের হাতে গচ্ছিত থাকবে? সবসময় কী পুরুষ জ্বলবে অভাবের ভয়ঙ্কর দহনে? তরমুজের স্ত্রীর মনে একের-পর-এক সিঁড়ি ভাঙতে থাকে । আর তরমুজ দাওয়ায় দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে, আমার জীবনের এই অবেলায় একটি নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি; যদিও সেই পথে কোনও আলো নেই, কিন্তু তা বাস্তব এবং সময়সাপেক্ষ । নিশ্বাসে একটি শিহরণ তার সারা শরীরময় ঘুরে বেড়ায় । একটি দুঃখের মেঘ তার মধ্যে ভাঙতে শুরু করে । সে একা, একেবারেই একা । ঘন নিবিড়তার মধ্যে কখন যে তরমুজের স্ত্রী তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে বুঝতে পারেনি, শুধু ভেবেই চলে, এখনও রাত গভীর হতে অনেক বাকি । তরমুজ যখন বাস্তবে ফিরে আসে তখন দেখতে পায় তার স্ত্রী টুংকাটি নিয়ে, এক বদনা জল দাওয়ায় রেখে গেছে । তারপর কাপড় শুকানোর বাঁশ থেকে একটি গামছা তুলে নিয়ে তরমুজের কাঁধে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে চৌকাঠ ধরে,

[৩১] কোথা ।
[৩২] শুনে ।

দশ-বছরের জীবনসঙ্গীর মত। তরমুজ তার দশ-বছরের জীবনসঙ্গীর দিকে মায়ভরা চোখে তাকিয়ে বলল, 'টুংকা খুলিয়া দ্যাখ কিতা আইনছি[৩৩]!' তরমুজের স্ত্রী হয়ত একজন বোকা মানুষ, স্বামীর চোখ দেখে কিছুই বুঝে না; শুধু গাছের মতই ছায়া দিয়ে যাচ্ছে তার স্বামীকে, সাহস দিয়েছে বাসা বাঁধতে, সন্তান দিতে; এছাড়া সে আর কী-ই-বা করতে পারে! বৃষ্টির সঙ্গে একটি দমকা হাওয়া এসে তরমুজের স্ত্রীর শাড়িটি দুলিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে একহাতে শাড়িকে সামলে নিয়ে বলল, 'কিতা আনছ কইলেই পার।' একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরমুজ বলল, 'ইচ্ছা আছিল বাজার তন ইলিশ আনমু। বুনা-বুনা[৩৪] করিয়া রানলে কত মজাই অইত; কিন্তু পয়সার জ্বালায় অইল না। উপায় না পাইয়া চারইটা এ্যণ্ডা আনলাম।' কথাগুলো শুনে তরমুজের স্ত্রীর মুখখানা মলিন হয়ে যায়, উঠোনের পাশের ঝিঙের পাতাগুলোও নেতিয়ে পড়ে। কী সামান্য সাধ! ইলিশ খাবে। কিন্তু তাদের মত সাধারণ মানুষের ভাগ্যে কী আছে জীবনের সামান্যতম সাধ পূরণের সামর্থ! সামান্য স্বপ্নও না! স্বামীর আলো-অন্ধকারে ঢেকে থাকা দেহের দিকে তাকিয়ে তরমুজের স্ত্রীর এসব কথা ভেবে যায়। তারপর মনে মনে বলল, তবুও ত বেঁচে থাকতে হয়; কিছু খেতে হয়; ভাঙাচোরা ঘরের খুঁটি ধরে সংসার সামলাতে হয়।

তরমুজের স্ত্রী তার স্বামীর দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনের মধ্যে আস্তেধীরে একটি কৃষ্ণছায়া নেমে আসে। অনেক কথা উপচে আসতে চায়, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না, তাই তার বুকের মধ্যে মাথাখোঁড়ে মরে নানারকম কষ্ট। স্বামীর সব সাধের কথা সে টের পায়, কিন্তু পুরোতে পারে না বলেই হয়ত বাবরুখানের বাড়িতে ঝিগিরি করে। রান্নাবান্না করে, ঢেঁকিতে পাট দিয়ে, মসলা বেটে, গরুঘর পরিষ্কার করে, কাপড় কেচে যে-কয়টি টাকা ও ধান-চাল আমি রুজি করি তা দিয়েই সুখ-দুঃখের এই সংসার চালাতে চেষ্টা করি– এসব চিন্তা মাথায় নিয়ে তরমুজের স্ত্রী নিঃশব্দে পা চালায় মূলঘরের দিকে। ঘর বলতে ত এই আটে-বারোতে তৈরি একটি খুপরি শুধু। এ-ঘরেই একখানা মাটির চৌকিতে শোয় ওরা দুজন; অপর পাশের কাঠের চৌকিতে শোয় তাদের সন্ত ান-দুটো। তরমুজের স্ত্রী কাঠের চৌকির নীচ থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় একটি বটি। সিঁকির দিকে এগিয়ে এসে মাটির পাতিলে পেঁয়াজের সন্ধান করে। তেলের শিশিটিও একবার আড়চোখে দেখে নেয়। তারপর সন্তর্পণে, টিপটিপ পায়ে মূলঘর ছেড়ে উপস্থিত হয় রান্নাঘরে। মূলঘরের উত্তরের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একচালা শণের ছাউনিটিই হচ্ছে তাদের রান্নাঘর। উনুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে তরমুজের স্ত্রী, ভিজে পাতা ও স্যাঁতানো গোবরের চট দিয়ে আঁচ তুলতে তার বেগ পেতে হচ্ছে। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। একসময় আঁচ ওঠে। আগুন উঠতেই একটি মাটির হাঁড়িতে চাল ও ডিম একসঙ্গে বসিয়ে দেয় সে; তারপর হাত বাড়িয়ে অন্ধকার হাতড়ে ঝিঙের মাচা থেকে দুটো ঝিঙে তুলে নেয়। বিকেলবেলা কয়েকটি মিষ্টি কুমড়োর ফুল তুলে এনেছিল সেগুলোতে আটা, নুন, হলুদ মিশায়; অল্প তেলে ভেজে নেওয়ার জন্য। একসময় সে ভাতের হাঁড়ি থেকে ডিমগুলো তুলে নিয়ে কোলস ছাড়ায়। দুটো ডিম পাঁচ-ফোড়ন দিয়ে কষা কষা করে রাঁধে, বাকি দুটো ভেঙে ঝিঙের তরকারি পাকায়। তরমুজ দূর থেকে ভারী নিরীহ চোখে এসব দেখে; এরইমাঝে একবার মূলঘরে উঁকি দিয়ে দেখে নেয় তাদের ছেলেগুলো কী করছে, সে নিশ্চিত হয় ওরা ঘুমোচ্ছে। তারপর রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তার স্ত্রীকে বলল, 'দুইটা টুকরি, বেউ আর ছিক্কাই ঠিক রাখিচ। বহুদিন বাদ[৩৫] আবার রাইত বাইরনি[৩৬] লাগব[৩৭]।' তরমুজের স্ত্রী সর্তক হয়; উনুনের আগুনে তার স্বামীর মুখের অস্পষ্ট রেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না; তাই প্রশ্ন করে, 'চুরিত যাইবা?' স্ত্রীর কথায় শিউরে ওঠে তরমুজ। সে জানে, আশ্বিনের বৃষ্টির রাতে চুরি করতে অনেক সুবিধা আছে– এমনরাতে অমাবস্যার চেয়েও গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে যায় গ্রাম; এমনরাতে শীতের চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা পড়ে, কাঁথা জড়িয়ে গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকে মানুষগুলো; এমনরাতে শত প্রয়োজনেও মহাজন ঘর থেকে বাইরে বেরুতে চায় না, গ্রামের কুকুরগুলোও নড়তে চায় না; আর এমনরাতে ঘরের মাটি বৃষ্টির জলে নরম থাকে, সিঁদ কাটতে কষ্ট হয় না, শব্দও

[৩৩] এনেছি।
[৩৪] কষা-কষা।
[৩৫] পরে।
[৩৬] বেরুতে।
[৩৭] হবে।

না– এ-কথা কী তার স্ত্রী বুঝে না! তাই প্রকাশ্যে বলল, 'দুরু চুতমারাউনি, মাতর[৩৮] ওপর মাতচ[৩৯] খালি[৪০]। কুচতা[৪১] বুজচ[৪২] না।' সঙ্গে সঙ্গে তরমুজের স্ত্রী বলল, 'বুজি, বুজি, হকলতাই[৪৩] বুজি। মন্দ পথে টাকা উপার্জন করতাচ তাও বুজি না?' তরমুজ ভাবে, সে মন্দ হতে চায় না, শুধু বাঁচতে চায়। চারদিকের এরকম অবিরাম ক্ষয়ের মাঝে নিজেরে আর ডুবাতে চায় না। তার জীবনের শর্তগুলো আলাদাই ছিল। কিন্তু...। 'চাইছলাম বউটারে লইয়া সুখ'র একটি সংসার বানাইতে। বউটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ত রাস্তায় কুড়াইয়া পাওয়া প্রেমমোহ না, যে হঠাৎ আইল আবার আচমকা পলাইয়া গেল। কিন্তু বাস্তব যে আরেকলাখান[৪৪]।' একসময় সে স্বপ্ন দেখত এখন আর দেখে না, মানুষ সবকিছুই সময় মত পেতে চায়, কিন্তু পায় না। তারপর প্রকাশ্যে বলল, 'একবারে অচল অইবার[৪৫] আগ[৪৬] কুচতা ত করন লাগব।' তরমুজের স্ত্রী জানে, এ ব্যাপারে আর কিছু বলা মানেই পণ্ডশ্রম, তরমুজ যা ভেবেছে তাই করবে, আর তা তাকে মেনে নিতেই হবে, তবুও বলল, 'আমি খালি জানতাম চাইলাম তুমি চুরিত যাইবা না কিতা!' চিলের ডানার শব্দের মত তরজুমের স্ত্রীর কথাগুলো তার কানের উপর দিয়ে উড়ে যায়। তরমুজের কাছে মনে হয়, তার স্ত্রীর কথাগুলো বাঁতে থাকার চেয়েও মারাত্মক। মেঘমেদুর আকাশে বিদ্যুচ্চমকাচ্ছে। আশ্বিনের বাতাসের ভিজে গন্ধ তার নাকে লাগে। স্ত্রীকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য বলল, 'চুতমারাউনি, তুই রান– পেট ভরব।' সঙ্গে সঙ্গে তরমুজের স্ত্রী উত্তর দিল, 'মজুর খাটলে পেট ভইরা[৪৭] ত খাইতামঐ। চুরি করার ধনে রাণী হওন লাগত না।' তরমুজের স্ত্রীর কথায় আহ্লাদের চেয়ে আঘাতই বেশী, তাই তরমুজ আহত হয়। তরমুজের স্ত্রী বলে যেতে থাকে, 'সাধ-আহ্লাদ ত সব চুলাত দিছি। বাবরুখার বাড়িত ঝিগিরি কইরা খাইতাছি। আর কেউ অইলে অতদিনে...।' বাক্যটি শেষ করতে পারে না সে, ইচ্ছে করেই হয়ত করে না, একমনে রান্না করতে থাকে, চুলোর আগুনে তুষের সঙ্গে তার সমস্ত দুঃখবেদনা পুড়িয়ে দিতে চাচ্ছে সে; কষ্ট-স্বপ্ন-সাধ-অভিমান-অবহেলা সবই যেন। তরমুজ অবাক হয়! তার স্ত্রীর মুখে এ-ধরণের নালিশ সে যেন এই প্রথম শুনছে। নালিশ করার স্বভাব ওর নেই, এমনকী অনুযোগও কখনও করেনি। চুলোর আগুনে উজ্জ্বল হওয়া তরমুজের স্ত্রীর মুখটি একদৃষ্টিতে দেখতে থাকে তরমুজ। চুলোর উপর থেকে হাঁড়ি নামিয়ে মাটিতে রাখতে রাখতে তার স্ত্রী যেভাবে তার দিকে তাকায় তাও যেন ওর কাছে অপরিচিত ঠেকায়। অভাবের কারণে তার স্ত্রীর ধৈর্যের বাঁধ যেন আজ ভেঙে গেছে, হয়ত তাও নয়, বাবরুখানই হতে পারে। তরমুজ সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, ছুটে যায় মূলঘরের দিকে। চৌকির নীচ থেকে হাত বাড়িয়ে সিঁদকাঠিটি টেনে আনে। চোখের সামনে তুলে ধরতেই দেখতে পায় সিঁদকাঠিতে মরচে ধরে গেছে। শিলপাথর দিয়ে বারান্দার এককোণে বসে সিঁদকাঠিটি ঘষতে থাকে, একমনে, যতই বাবরুখানের কথা মনে হচ্ছে ততই জোরে জোরে ঘষতে থাকে। জীবনে নানা আঘাত সে টের পেয়েছে, কিন্তু বাবরুখানের বাড়িতে তার স্ত্রীর ঝিগিরি করার ব্যথাটি সে যেন আর সহ্য করতে পারছে না। শরীর মরে গেলেও মন মরে না, তার স্ত্রীর মনের মধ্যে একটি ব্যথা আত্মগোপন করে আছে তা আজ সে রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করছে। যদিও শরীর ছাড়া জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় না, শরীর বাদ দিলে নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা দ্বীপের মানুষ হয়ে যায়, তবুও আজ সে যেন সেই শরীরকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। এখন তাকে কিছু-একটা করতে হবে। চারিদিকে জলের শব্দ, এরইমাঝে দূর থেকে একটি লক্ষ্মীপেঁচার ডাক তার কানে ভেসে আসে, এ-যেন বৃষ্টিভেজা রাতের রহস্যময়তার মধ্যে ভালোবাসার সুর বয়ে আনার বাহক। এই নির্মম সত্যকে সোজাসুজি প্রকাশ করলে সমাজের বন্ধন থেকে সরে আসতে হবে তাকে, বা সমাজের স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হতে হবে; এখনও

---

[৩৮] কথার।
[৩৯] কথা বলা।
[৪০] শুধু।
[৪১] কিচ্ছু।
[৪২] বুঝ।
[৪৩] সবকিছুই।
[৪৪] অন্যরকম।
[৪৫] হওয়ার।
[৪৬] আগে।
[৪৭] ভরে।

গভীর রাত হয়নি, তাই কিছুই প্রকাশ করা যাবে না; তবে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, বৃষ্টির বেগও বেড়ে চলেছে। কখন যে তার স্ত্রী উনুন নিভিয়ে, রান্নাঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে, তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কখন যে ওর শরীরের ঘ্রাণ তাকে জড়িয়ে ফেলেছে, সে টের পায়নি। ভাত খাওয়ার জন্য সে তার স্বামীকে আহ্বান জানায়। আশ্চর্য এই নারীর আহ্বান, যাকে একধরণের টানও বলা যায়, এ-যেন ভালোবাসার প্রত্যয় ও অনিবার্যতার আহ্বান।

ঘুম থেকে জাগিয়ে হুরুত্তা-দুটো নিয়ে তরমুজ পাটিতে বসে অর্ধবৃত্তাকারে, আর তার স্ত্রী একমনে খাবার পরিবেশন করতে থাকে। স্বামীর থালায় একটি কষা কষা করে রান্না করা ডিম, দুটো ভাজা মিষ্টি কুমড়োর ফুল ও ঝিঙের তরকারি তুলে দেয়। একইভাবে সাজিয়ে দেয় সন্তানদের থালাও, শুধু কষা কষা করে রান্না করা অপর ডিমটিকে দুভাগে বিভক্ত করে নেয়। থালাতে হাত দিয়ে তরমুজ ভাবতে থাকে, পেট বোজাই করে খেলে এমনি এমনি ঘুম আসবে, ছুটতে কষ্ট হবে, তবুও লোভ সামলাতে পারে না সে; তার স্ত্রীর রান্নায় অপূর্ব একটি গুণ বাঁধা আছে, সে যা রাঁধে সবকিছুই যেন সুস্বাদু, রান্নার গন্ধেই হৃদয় ভরে ওঠে তৃপ্তিতে; বড় শিরের সবগুলো দানা পেটে ঢুকিয়ে নেয় তরমুজ; সারাটি জীবন মন্দ-মানুষের মধ্যে কাটালেও, অনেকটা ময়লা গায়ে লাগালেও, সে অর্ধেকটা ডিম একপাশে তার স্ত্রীর জন্য রেখে দিতে দিতে সস্নিগ্ধ চোখ তুলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওর পানে। রাত যেন আরও রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। তরমুজের মনে ভালোবাসা, অভাব-অনটনের একটি মানচিত্র রচনা করতে থাকে। আর তরমুজের স্ত্রী থালা-বাসন ধুয়ে, বেউ-ছিক্কি এনে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'চুরি করা গুণা। আত[৪৮] কাটা যাইব।' একটি গভীর যন্ত্রণার জায়গা থেকেই তার স্ত্রী কথাগুলো বলেছে, কিন্তু তরমুজের মগজ ছাপ্পান্ন, তবুও নিজেকে সামলে নেয়, মনের কথা গোপন রেখে যুক্তি দেয়, 'নিজর হুরুত্তার পেটত ভাত নাই। তাও চুরি করতাম না। কিন্তু এখন আরকজন'র হুরুত্তার উপাস ঠেকাইবার লাগি চুরি করনই লাগব। এছাড়া পথ নাই। আল্লাহ যদি ঐ হুরুত্তার রিজিক রাইখা তাকইন চোদরি-বাড়ির ধন-ভাণ্ডারে, তখন চুরি ছাড়া আর কিতা করার আছে? তা অইলে কামটা ত আল্লার ইচ্ছায় অইতাছে। কু-কামেরও যুক্তি আছে– বুঝচসনি।' তরমুজের যুক্তি ত আর তার স্ত্রী বুঝে না। সে তার স্থির দৃষ্টি তরমুজের দিকে নিক্ষেপ করে বলল, 'তোমার পাও দরি[৪৯], তুমি যাইঔ না।' স্ত্রীর দিকে না-তাকিয়ে তরমুজ রাগের মাথায় বলল, 'চুতমারাউনি, তুই বাবরুখানের শরীর মারা দে– টাকা পাইবে। না অইলে হুরুত্তারে বাঁচাইবার বা চাচির চাউল ফিরৎ দিবার আর কনঅ[৫০] উপায় চউকে[৫১] দেখরাম[৫২] না।' ধপ করে বসে পড়ে তরমুজের স্ত্রী। চোখে আঁচল। মেয়েদের কত কিছুতেই কাঁদতে হয় তার কী হিশেব আছে! তার স্ত্রীকে সে কাঁদতে অনেক দেখেছে। যদিও তরমুজ জানে, স্ত্রী ছাড়া তার আর কেউ নেই, তবুও ঘরে বসে এরকম কান্না দেখার ইচ্ছে তার নেই। তার মনের মধ্যে দপদপ করে জ্বলছে বাবরুখান। বৃষ্টিধারার গভীরতা কোমল হয়ে এলেও পিটুর পিটুর চলছে, উঠোনের মাটি কাদা না-হলেও শক্ত নয়, আর যে-জায়গাটি কিছুটা টানটান ছিল সেটাও পিচ্ছিল, পা ধরানো কঠিন। তরমুজের সংসারের ক্ষুধার চেয়ে বেশী তার চাচীর, তারও চেয়ে বেশী বাবরুখানের হীনদৃষ্টি, তাই রওয়ানা দেয় সে খালি ভার কাঁধে নিয়ে, বিসমিল্লাহ বলে। তরমুজের কথা বলার সময় নেই, তবুও তার স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ মানে-সম্মানে আমারে ফিরাইয়া আইন্অ[৫৩]। আমার তাকদির তোমার লেখা মোতাবেক কাম করতাছে। আমার দোষ নিও না হে খোদা। তোমার হুকুম ছাড়া গাছ'র পাতাও লড়তে[৫৪] পারে না। তোমার হুকুমঐ চল্লাম।'

[৪৮] হাত।
[৪৯] ধরি।
[৫০] কোনও।
[৫১] চোখে।
[৫২] দেখি।
[৫৩] এন্।
[৫৪] নড়তে।

চৌধুরী-বাড়ির পিছনের পাঁচিল টপকে আমবাগানে এসে দাঁড়ায় তরমুজ। বড়ো আমগাছের বিশাল ডাল বেয়ে ছাদে পৌঁছোনো সম্ভব। তখনই তার মনে পড়ে যায়, যদি চিলেকোঠার দরজাটি বন্ধ থাকে তখন কী উপায় হবে? বিশাল আমগাছটি ঘেঁষে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে সবকিছু পরীক্ষা করতে থাকে তরমুজ। পূবালী ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দক্ষিণ দিকের একটি ঘর থেকে আবছা আবছা একটি শব্দও ভেসে আসছে, হয়ত সে-ঘরে বড় দামান্দ আশ্রয় পেয়েছে; সকালেই ত সে ফিরে যাবে তাই হয়ত তার স্ত্রীকে শেষবারের মত আদর করছে। তরমুজ মনে মনে বলল, আরকটু রিজাতে অইব। জামাই-বউর শরীর দখলা-দখলি হেষ হুক। বিশাল আমগাছের তলায় বসে অপেক্ষারত তরমুজ। সে এক বোতল সরষের তেল টুকরি থেকে বের করে হাতে, পায়ে, বুকে, পিঠে চপচপ করে মাখতে থাকে; কেউ তাকে ধরলে সহজেই যেন পিছলে যায়। বৃষ্টি শুরু হয় আবার। বৃষ্টির জল আমপাতা গলে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়ছে; পড়ছে তার মাথায়, পেট বেয়ে কোমরে, আর চুল বেয়ে, পিঠ বেয়ে একেবারে কোলে। তা পড়ুক। ঠাণ্ডা লাগছে তরমুজের। সে উঠে দাঁড়ায়। লুঙ্গি খুলে একমনে তেল মাখতে থাকে শরীরের অবশিষ্ট অংশে, কোনও জায়গা বাদ দেয় না। একটি লেঙটি পরে মাথায় গামছা জরায়; চট করে কেউ যেন তার মুখাবৃত্তি চিনতে না পারে। সে আবার বসে বিশাল আমগাছটির নীচে। কয়েক মিনিটে বৃষ্টির জল গামছা ভিজিয়ে, কালো লেঙটি জুবিয়ে চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেদিকে তরমুজের খেয়াল নেই, ওর নজর দক্ষিণের ঘরটিতে। জানালার ফাঁকে সে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, হারিকেনের আলোতে মশারির দোলা, মানুষের নড়াচড়া। আস্তেধীরে উঠে দাঁড়ায় তরমুজ আবার। বেগুন গাছের কাঁটায় গুঁতো লাগে, তবে অন্ধকারে বেগুন দেখা যায় না। কুকুরের সাড়াশব্দও নেই। শুনেছে শৌচাগারে পেতনী থাকে, পেতনীর বদলে পরীও ত হতে পারে, এই স্থান দিয়ে দিনের বেলাই কেউ চলাফেরা করতে চায় না, ভয় পায়; পেতনী আর চোর সহদয় ভাই যেন, রাতের বেলায় তাদের চলাফেরা। হঠাৎ তরমুজের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, মনে ভয় জমেছে, সে নিশাচর চোর হলেও তার মনে এরকম ভয় বাস করতে পারে, হাত-পা পাথর হয়ে আসছে যেন। সে মনে মনে বলল, লক্ষ্মী যদি পরাণে বাঁচায়। কীসের নড়াচড়া– একটি শব্দ তরমুজের কানে ভেসে আসে। মানুষ নয় ত! দেখে, একটি ইঁদুরের পিছু পিছু একটি বিড়াল দৌড়াচ্ছে। একটু পরেই বিড়ালটি, অন্ধকারের আস্তর ভেদ করে পৌঁছে যায় দক্ষিণের বারান্দায়। না কোনও মানুষ জেগে নেই; সমস্ত বাড়ি জুড়ে স্তব্ধতা বিরাজ করছে। অন্ধকারে ঢেকে নিয়েছে সমস্ত বাড়িটি, শুধু দূর থেকে মাঝেমধ্যে নিশিপলকের হাঁক ভেসে আসছে। অন্যকোনও দিকে তরমুজ ঢোকার সমান্যতম পথ খুঁজে না-পেয়ে রান্নাঘরের পশ্চিমের বারান্দায় সে পৌঁছে মনে মনে বলল, কিছুদিন আগে আমি চোদরি-বাড়ির পাকঘরর[৫৫] চাল ঠিক করতে আইছলাম[৫৬]। তখন দেখলাম, পাকঘরর পছমর[৫৭] বেড়ার গালাত[৫৮] এক মটকি চাউল। ঐ মটকিত তারা যখন চাউল রাখইন তখন কমবেশি তার সন্ধান পাওয়া যাইব। বৃষ্টির জল পড়ে বারান্দার মাটি নরম হয়ে আছে। সিঁদকাঠি দিয়ে দুটো আঘাত করতেই এমনি এমনি মানুষ ঢোকার পথ হয়ে যায়, খোলাসা দরিয়া যেন। ঘরে ঢুকে সে দেখে এক মটকি ভর্তি চাল। যেপথ দিয়ে সে ঢুকেছে সে-পথের খুব কাছেই মটকিটি। তারই পাশে পশ্চিমের দরজা, দরজাটি খুললেই যে-পথের সন্ধান পাওয়া যায় সে-পথটি সহজেই নিয়ে যায় পুকুরপাড়ে, বাঁশবনে। দরজাটি আস্তেধীরে খুলে মটকির নীচে টুকরি রাখার জায়গা করে নেয় তরমুজ। তারপর বাঁকা রডের মাথা দিয়ে এক আঘাতে ছিদ্র করে ফেলে, আর মটকি থেকে রডটি সরিয়ে নিতেই হরহর করে চাল পড়তে থাকে। তখনই তরমুজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় রান্নাঘর ও মূলঘরের মধ্যকার দরজাটির উপর। সে এগিয়ে আসে। হাত দিয়ে একটু ধাক্কা দিতেই আপনা-আপনি দরজাটি খুলে যায়। তরমুজ অবাক হয়! দরজা ত খোলার কথা না, হয়ত কেউ শিকল তুলতে ভুল করেছে। তরমুজের লোভ চকচক করে ওঠে। মহাজনের বেখায়ালে দরজা খোলা থাকায়, তরমুজের কাছে অন্ধকারে তার ধন চুরি করা গৌরবময় হয়ে ওঠে। অন্ধকার ভেঙে মূলঘরে পা দেয় সে। সে উপলব্ধি করে সারা ঘরময় ঘুমন্ত মানুষের একটি শান্ত আবহাওয়া বইছে। বিনে কষ্টে, নিঃশব্দে, মহাজনের ধন লুট করে নেওয়ার

[৫৫] রান্নাঘরের।
[৫৬] এসেছিলাম।
[৫৭] পশ্চিমের।
[৫৮] নিকটে।

উত্তেজনা আরও তীব্রতর হতে থাকে। করিডোর মাড়িয়ে এগিয়ে চলে সে। যে-ঘরে চৌধুরীর মেয়ে ও তার স্বামী শুয়ে আছে সে-ঘরের সামনে পৌঁছতেই সে বুঝতে পায়, ঘরের ভেতর থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে তার চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলো এসে পড়ছে। দরজার ফাঁকে সে সুস্পষ্টই দেখতে পায়, ঘরের দরজাটি ভেতর থেকে ভালভাবে বন্ধ করা হয়নি। বাঁকা রড দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে মৃদু আঘাত করতেই দরজাটি মৃদু শব্দে খুলে যায়। আস্তেধীরে সে ঘরে প্রবেশ করে। শিশুকে একপাশে রেখে স্বামী-স্ত্রী জাড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। বিছানার পাশের ছোট টেবিলে রাখা শিশুর দুধের বোতলটি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে তরমুজের কর্মকাণ্ড। এখনও বোতলে বেশখানিক দুধ পড়ে আছে। তরমুজ এগিয়ে যায়। বোতলে হাত দিতেই সে বুঝতে পারে, বোলতটি গরম; কিছুক্ষণ আগে দুধ তৈরি করতে গিয়েই বোধ হয় মেয়েটি দরজায় শিকল তুলে দিতে ভুলে গেছে। ঘুমন্ত মানুষগুলোর দিকে আরেকবার তাকায় তরমুজ। মেয়েটির ঘুমানো ভঙ্গি যেন তরমুজের স্ত্রীর মত, কিন্তু পরনে দামী শাড়ি ও হাতে স্বর্ণের চুড়ি। ঘুমন্ত মুখের একপাশের নাক-ফুলটি তার স্বামীর সঙ্গসুখের অনুভূতি মাথা উচ্চু করে আত্মপ্রকাশ করছে, তবে তার মুখটি গহনার ভারে কেমন যেন বিষণ্ন ও করুণ দেখাচ্ছে, হয়ত-বা তার স্বামী আগামীকাল তাকে ছেড়ে চলে যাবে তাই এরকম দেখাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে মেয়েটির দেহ থেকে গহনাগুলো তুলে নিতে পারে তরমুজ, কিন্তু নিশীভিযানের সাফল্যের মধ্যেও কেমন যেন করে ওঠে তার অন্তর। পরম আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে তা করতে পারে না, বরং লণ্ঠনের আলো নিভিয়ে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, খাটের পাশে রাখা ব্রিফকেস, ড্রেসিংটেবিলে রাখা অলঙ্কারের কৌটাটি ও হাতের কাছে যা-কিছু মূল্যবান জিনিশ পায় সবকিছু তুলে নেয়; তারপর ঘুমন্ত মানুষের রাজ্য অতিক্রম করে সে নিঃশব্দে ফিরে আসে রান্নাঘরে। টুকরি ফুলে উঠেছে চালে। কিছুটা চাল দিয়ে অন্য টুকরিতে রাখা মূল্যবান জিনিশপত্র ঢাকা দেয় তরমুজ, তারপর ভার কাঁধে নিয়ে বাঁশবনে হারিয়ে যেতে তার সময় লাগে না।

রাত থাকতে থাকতেই বাড়িতে ফিরে আসে তরমুজ। বৃষ্টিভেজা ঝিঙে পাতার ফাঁকে চুপিসাড়ে শুয়ে শুয়ে হালকা হাওয়া চামর বুলিয়ে যাচ্ছে ঝিঙে লতায়। ঝিঙে লতাও কথা বলে, তবে শোনার কান চাই, সে বৃষ্টিভেজা পৃথিবীর মজা দেখছে নীরবে দাঁড়িয়ে। তরমুজের কাছে রাত অনেক সহনীয় হয়ে ওঠে, তাই সে তার স্ত্রীর পাশে শরীরটি এলিয়ে দিয়ে কাঁথার ভাঁজে ভাঁজে নিজেকে খুঁজে নিতে চাচ্ছে।

তরমুজের স্ত্রী বলল, 'কেউর ঘুম ভাঙল না।'

রাতের ঘন অন্ধকারে তরমুজ তার স্ত্রীর দেহের প্রত্যেকটি ভাঁজ আবার চিনে নিতে চায়। শরীর দিয়েই মানুষ মানুষকে জানে। শরীরই হচ্ছে আদি ভালোবাসার উৎস। মানুষের শরীর না-থাকলে জীবনে আর কীই-বা থাকতে পারে! তরমুজ তার স্ত্রীর শরীরকে ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'আশ্বিন মাসর মেঘর রাইত ভাত খাইয়া ঘুমাইলে কিতা আর হুশটুশ তাকে[৫৯] না কিতা? আর আমারই হুশ আছলনি অন্য কুছতা দেকবার[৬০], কাম হাসিল'র কুসিতে[৬১]।'

তরমুজের স্ত্রী নিজের মনের কষ্ট হারিয়ে তার স্বামীর শরীর দখল করে নেয়। তরমুজ মনে মনে বলতে থাকে যে, বাবরুখানকে হরানোর ব্যর্থতা ভুলে যেতে চায় সে তার শরীর দখল করে নিয়ে। চাল ও লাখ-টাকার সম্পদ পেয়ে তুষ্ট হতে চায় না যেন সে। আর প্রকাশ্যে, বিড়বিড় করে বলল, 'বাবরুখানকে আর খাওন লাগব না। আমারেই খাইয়াই তুষ্ট হুক[৬২] তোর পরাণ।' এখনও ঘুমিয়ে থাকা ঝিঙে-ফুলের উপর বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়নি।

[৫৯] থাকে।
[৬০] দেখার।
[৬১] খুশিতে।
[৬২] হোক।